‘শান্তির দেশ’ বাংলাদেশ!

● হাবিবুর রেজা

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একেক সময় একেক জরিপ হয়। কখনো বলা হয়, বাংলাদেশ সবচেয়ে ‘সুখী মানুষদের দেশ’; কখনো বলা হয়, ‘শান্তির দেশ’। কিন্তু আসলে যে এখানকার মানুষ কেমন আছে, তা কবি সুনীল অনেক আগেই বলে গেছেন একটিমাত্র বাক্যের মধ্য দিয়ে, ‘আমি কী রকমভাবে বেঁচে আছি তুই এসে দেখে যা নিখিলেশ।’ বিশ্ববাসী, আসুন, কয়েকদিন থেকে দেখে যান, আমরা আসলেই শান্তিতে আছি কিনা...

শান্তিসূচকে বাংলাদেশ এগিয়ে আছে সেই ভারতের চেয়ে, যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাদের স্বাধীনতা দিবসে জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে অনুতাপ করেছেন দেশটিতে একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে দেখে, বলেছেন, ‘লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যায়...’; বাংলাদেশ এগিয়ে আছে পাকিস্তানের চেয়েও, যে পাকিস্তানে স্বাধীনতা দিবসের রাতেও কোয়েটায় বিমানবাহিনীর দুটি ঘাঁটিতে জঙ্গি আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে, উত্তর ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের হত্যাকা-ের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর ওপর আরো হামলা চালানো হবে বলে জানিয়েছে তালেবানের একটি শাখা ফিদাইন ইসলামের মুখপাত্র ও নেতা হিসেবে পরিচয়দানকারী গালিব মেহসুদ; বাংলাদেশ এগিয়ে আছে আফগানিস্তানের চেয়েও, যেখানে সরকারসমর্থিত শান্তি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে গেল সপ্তাহেও আত্মসমর্পণ করেছে ৪৫ তালেবান জঙ্গি আর গত এক বছরে আত্মসমর্পণ করেছে প্রায় চার হাজার তালেবান।

আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড পিসের ২০১৪ সালের প্রতিবেদনে ‘বৈশ্বিক শান্তি সূচক’ অনুযায়ী বাংলাদেশ এ সুনাম বয়ে এনেছে। কিন্তু আমরা যারা এ দেশেই বসবাস করছি, তারা কি বলতে পারব, আছি–শান্তিতেই আছি? এই যে মাওয়ায় লঞ্চডুবি হলো, এখনো তো স্বজনহারানোর বেদনা ছড়িয়ে আছে আকাশে-বাতাসে, তা হলে কী করে খুশি হই আমরা বাংলাদেশের এই অবস্থানে? তা ছাড়া পৃথিবীতে কিংবা দক্ষিণ এশিয়ায় তো কেবল ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানই নয়, আরো অনেক রাষ্ট্র আছে। দক্ষিণ এশিয়াতেই রয়েছে আরো দুটি রাষ্ট্র নেপাল ও ভুটান– যারা শান্তিসূচক অনুযায়ী রয়েছে বাংলাদেশের চেয়েও উচ্চ অবস্থানে। আবার এ প্রতিবেদন প্রণীত হয়েছে মোট ১৬২টি দেশকে ঘিরে, সে তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ৯৮তম স্থানে। প্রতিবেদন বলছে, বৈশ্বিক শান্তির সূচক অনুযায়ী বাংলাদেশ একটি মধ্যম পর্যায়ের দেশ। মধ্যম পর্যায়ের শান্তিই যদি এত অশান্তিময় হয়, তা হলে নিম্নপর্যায়ের শান্তিময় দেশগুলো যে কী অবস্থানে আছে, তা ভেবে শিউরে উঠতে হয়।

বাংলাদেশের এই ‘শান্তিময়’ পরিস্থিতি আরো ‘শান্তিময়’ করতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ইতিমধ্যে আরো বেশকিছু উদ্যোগ নিয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম একটি হলো, জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালার অনুমোদন ও অনলাইন নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এ দেশে এখন কোন পর্যায়ে আছে তা বোঝা যায় রামপালের একটি ঘটনা থেকে–একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ বন্ধের দাবিতে ঢাকা থেকে সেখানে গিয়ে পৌঁছে গত ১৫ আগস্ট। শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে তাদের ওপর হামলা চালায় রামপাল উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুর রউফের নেতৃত্বে ৩০-৪০ জন। তাদের সহযোগী হিসেবে এগিয়ে আসে স্থানীয় পুলিশ। রামপাল থানার ওসি কাজী দাউদ হোসেন বলেছেন, আবদুর রউফ, মানে আওয়ামী লীগের সভাপতি তাকে খবর দেন কিছু বহিরাগত যুবক স্থানীয় গ্রামবাসীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে। তখন তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে সেখানে যান। তাদের ট্রলারে তুলে ফেরত পাঠিয়ে দেন তারা! এভাবেই ‘পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ’ করছেন বা ‘শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি’ নিশ্চিত করছেন আওয়ামী লীগ ও পুলিশ। এই আওয়ামী লীগের রয়েছে নামসর্বস্ব ভুঁইফোঁড় অন্তত ৫০টি সংগঠন– যাদের আসলে ‘রাজনৈতিক দোকান’ বলাই ভালো। এরকম দোকান যে দেশে থাকে সেদেশের ‘শান্তি’ কেমন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তবে আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা বাংলাদেশকে যত শান্তিপূর্ণই বলুক, বিএনপি তা মানতে নারাজ। ১৬ আগস্ট রাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সদস্যের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় খালেদা জিয়া মন্তব্য করেছেন, এই সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নষ্ট করছে (এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, বিএনপির বিভিন্ন নেতা বিভিন্ন সময় তাদের বক্তব্যে বলে থাকেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছে); বলেছেন, ‘আজ দেশে মানুষ বলুন, কোনো ধর্মের মানুষ বলুন, কেউ শান্তিতে নেই।’ শান্তি কোথায় কীভাবে পাওয়া যাবে, সে পথেরও ইঙ্গিত দিয়েছেন খালেদা জিয়া, বলেছেন, ‘দেশ এক কঠিন সময় অতিক্রম করছে। এ থেকে উত্তরণে শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা অনুসরণ করলে সমাজে ও রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে (বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ১৬ আগস্ট)। আহ, কী সুন্দর পরিস্থিতি–প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কয়মাস আগে বলতে শোনা গেছে, ‘প্রয়োজনে রাষ্ট্রকে মদিনা সনদ অনুযায়ী পরিচালনা করা হবে’ আর এখন খালেদা জিয়া বলছেন, শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা অনুসরণ করলে সমাজে ও রাষ্ট্রে নাকি শান্তি আসবে। আমরা তা হলে এখন কোনদিকে যাব বলুন!

‘শান্তিপূর্ণ’ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য

বিএনপি এর মধ্যে 'শান্তিপূর্ণ' পথে আন্দোলন করার সদিচ্ছায় আন্দোলনের 'নরম' কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জন্মদিন পালন করার চেষ্টা ছিল সেই 'নরম' কর্মসূচিরই প্রস্তুতি। পরদিন ১৬ আগস্ট গাজায় গণহত্যার প্রতিবাদে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট পালন করেছে কালো পতাকা দিবস। ১৯ আগস্ট তারা পালন করতে চলেছে জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালার প্রতিবাদে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশ। খালেদা জিয়ার 'জন্মদিন' উপলক্ষে ১৪ আগস্ট স্বাধীনতা ফোরামের 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে খালেদা জিয়ার ভূমিকা' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় বিএনপির উদ্যোগে খালেদা জিয়ার জন্মদিন পালনের জন্য আওয়ামী লীগকেই দায়ী করেছেন গয়েশ্বর রায়। তার মতে, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের 'তির্যক' কথাবার্তার কারণেই খালেদা জিয়ার জন্মদিন পালন বিএনপির জন্য 'অপরিহার্য' হয়ে উঠেছে। ওই আলোচনা সভায় গয়েশ্বর রায় যা বলেছেন, সেটা পর্যালোচনা করে খালেদা জিয়ার আরো একটি জন্মদিনই শুধু নয়, আরো একটি জন্মসালও পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, ওইদিনের আলোচনায় তিনি বলেছেন, '১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যেদিন শেষ হয়, সেদিনই জন্ম হয়েছিল তার।' বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে যদি তথ্যবিকৃতি ঘটে না থাকে, তা হলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে ১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর। আবার খালেদা জিয়ার পাসপোর্টের তথ্যানুযায়ী, তার জন্মসাল ১৯৪৬। গয়েশ্বর রায়ের বক্তব্য অনুযায়ী, খালেদা জিয়ার নাম প্রথমে রাখা হয়েছিল 'শান্তি'। তার এই জন্মদিনের রাজনীতি অবশ্য 'শান্তি'র কোনো ইঙ্গিত দেয় না।

কে কবে জন্মদিন পালন করবে, তা রাজনীতির বিষয়-আশয় হওয়ার কথা নয়। কিন্তু জন্মদিনকে যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পালন করা হয়, তা হলে তার রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়াই স্বাভাবিক। ঈদুল ফিতরের আগে যখন বিএনপির নেতারা জানাচ্ছিলেন, ঈদের পর তারা আন্দোলনে যাবেন, তখন মানুষ আশা করেছিল, তাদের ওই আন্দোলনে জনগণের চাওয়া-পাওয়াকেই গুরুত্ব দেয়া হবে। জনগণের সেই চাওয়া-পাওয়াকে বিএনপি কতটুকু গুরুত্ব দিচ্ছে, সেটি বোঝার একটি উত্তম দিন হতে পারত ১৫ আগস্ট। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে ১৫ আগস্টে বিএনপির কার্যালয়ে এত প্রহরার ব্যবস্থা করা হলো যে, ১৫ আগস্টকে নিয়ে বিএনপির জন্মদিনের রাজনীতি কতদূর যেতে পারে, একটি দেশের স্বাধীনতাকালীন অবিসংবাদিত নেতা বলুন আর প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি বলুন, তার পরিবারসহ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের দিনে রাষ্ট্রক্ষমতার বাইরে থাকা একটি দল কী ধরনের রাজনৈতিক আচরণ করে, তা দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো সাধারণ জনগণ। আমাদের আর জানা হলো না, ৬৯ কিংবা ৭০তম জন্মদিনের ওজন কত কেজি হতে পারত। তবে অন্তত এটুকু বোঝা গেল, নরম হোক, গরম হোক– আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিএনপির সংগঠিত হতে এখনো অনেক বাকি। আন্দোলনের স্থির লক্ষ্য নিয়েই ঈদের আগে বিএনপির ঢাকা মহানগর শাখা নতুন করে গঠন করা হয়েছিল। খুব দ্রুত আন্দোলনে যাওয়ার প্রস্তুতির তাড়া অবশ্য বিদেশে অবস্থানরত বিএনপি নেতা তারেক রহমানের পক্ষ থেকেও ছিল। সাংগঠনিক অবস্থা যে রকমই হোক না কেন, আন্দোলনে না গেলে দলের অস্তিত্ব যে বিপন্ন হয়ে পড়বে, সে আলোচনা বিএনপির মধ্যেই দানা বেঁধে উঠেছিল। আন্দোলনের পাশাপাশি দলকে পুনর্গঠন করার ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি নেয়ার লক্ষণও দেখা যাচ্ছিল। এই আন্দোলন যে 'মারমুখো' হবে না, 'সরকার পতনের' লক্ষ্যে হবে না, সে আভাসও পাওয়া যাচ্ছিল। যেমন ১৭ জুলাই প্রেস ক্লাবের এক ইফতার অনুষ্ঠানে খালেদা জিয়া বলেছিলেন, 'যুদ্ধ ঘোষণা করা হচ্ছে না। আন্দোলন হবে শান্তিপূর্ণ।' দেড় মাসব্যাপী বিভিন্ন 'জনসম্পৃক্ততামূলক' ও 'শান্তিপূর্ণ' কর্মসূচি পালনের পরিকল্পনা নিয়ে ঈদের পর মাঠে আসে বিএনপি। এ পরিকল্পনারই অংশ হিসেবে ঈদের আগে ১৮ জুলাই রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসকে আহ্বায়ক করে ঢাকা মহানগর বিএনপির নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে কমিটিতে নিয়োগ দেয়া হয় বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আবদুল আউয়াল মিন্টুকে। কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে নিযুক্ত করা হয় হাবিব-উন-নবী খান সোহেলকে। কিন্তু এ কমিটি কতটুকু সক্রিয় হতে পারবে সেটা বোঝা গেল ১৫ আগস্টেই– মহানগর কমিটির আহ্বায়ক মির্জা আব্বাসকেই বিএনপির কেন্দ্রীয় অফিসের ধারেকাছে দেখা যায়নি সেদিন। বিশ্লেষকদের ধারণা, এই কমিটি নিয়ে বিএনপির কোনো অংশই খুশি হতে পারেনি এবং এত বড় কমিটি দিয়ে (৫৩ সদস্যের) সত্যিই কোনো কাজ হবে কি না, তা নিয়েও রয়েছে সংশয়-সন্দেহ। একপক্ষ মনে করছে, নতুন কমিটির আহ্বায়কের ইমেজ সঙ্কট রয়েছে। কিন্তু স্বয়ং মির্জা আব্বাসও যে এ কমিটি নিয়ে খুশি নন, তা বোঝা গেছে কমিটি গঠনের পর তার সঙ্গে দেখা করতে আসা কাউকে কাউকে তিনি সাক্ষাৎ না দেয়াতে। তবে যত দ্বন্দ্বই থাক, এ কমিটি যে খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের মনোনীত কমিটি, তাতে কোনো সংশয় নেই। এর মধ্যে খালেদা জিয়া ১৯ জুলাই সৌদি আরব গিয়েছিলেন। সেখানে ২০ জুলাই যান তারেক রহমান। এক কথায় বলতে গেলে, বিএনপির রাজনৈতিক কর্মসূচি এখন যে পথে এগুচ্ছে তা তাদের ওই সাক্ষাতেই চূড়ান্ত হয়েছে।

ঈদের পর বাংলাদেশের 'গণতন্ত্র রক্ষার জন্য' আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছিল আরো একটি সংগঠন নাগরিক ঐক্য। এক ইফতার পার্টিতে নাগরিক ঐক্যের নেতা মাহমুদুর রহমান মান্না বলেছিলেন, ঈদের পর 'যারা বলে যে কামাল হোসেনকে দিয়ে কিছু হবে না, তারা দেখবে ড. কামালকে দিয়ে কী হয়।' তিনি আরো বলেছিলেন, 'আমাদের আন্দোলন সফল হবে। কারণ, জনগণ জানে, মাহমুদুর রহমান মান্না যখন কথা বলে, ড. কামাল হোসেন যখন কথা বলে, শাহদীন মালিক যখন কথা বলে, ড. আসিফ নজরুল যখন কথা বলে তখন তারা কোনো ধান্দাবাজি থেকে কথা বলে না' (বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ১৮ জুলাই)। কিন্তু এখনো কোনো আন্দোলনের কর্মসূচি আসেনি তাদের পক্ষ থেকে। তাদের সেই ধান্দাবিহীন কর্মসূচির সঙ্গে বিএনপির নেতৃত্বাধীন এই জোটের কর্মসূচির কোনো যোগাযোগ থাকবে কি না, সেটিও স্পষ্ট নয় এখন পর্যন্ত। এদিকে শোনা যাচ্ছে, নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ বা জেএমবি আবারো চেষ্টা করছে নতুন কর্মী সংগ্রহ করে সক্রিয় হওয়ার। বাংলাদেশে একযোগে সিরিজ বোমা হামলা চালিয়ে এ দলটি একসময় বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আলোচিত করে তুলেছিল। বাংলাদেশে এমনিতেই মানুষ জন্মমৃত্যুর ভয়াবহ রাজনৈতিক খেলায় দিশেহারা; এর ওপর এই জঙ্গিরা যদি সত্যিই ফের সংগঠিত হতে থাকে, রাজনৈতিক অপতৎপরতায় মেতে ওঠে, তা হলে এখানে যেটুকু শান্তি আছে, তা-ও যে উবে যাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একেক সময় একেক জরিপ হয়। কখনো বলা হয়, বাংলাদেশ সবচেয়ে 'সুখী মানুষদের দেশ'; কখনো বলা হয়, 'শান্তির দেশ'। কিন্তু আসলে যে এখানকার মানুষ কেমন আছে, তা কবি সুনীল অনেক আগেই বলে গেছেন একটিমাত্র বাক্যের মধ্য দিয়ে, 'আমি কী রকমভাবে বেঁচে আছি তুই এসে দেখে যা নিখিলেশ।'

বিশ্ববাসী, আসুন, কয়েকদিন থেকে দেখে যান, আমরা আসলেই শান্তিতে আছি কিনা... ■